ইঙ্গ মার্কিণ চক্রের আবার যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা

পুঁজিপতিদের মুনাফার বলি লক্ষ লক্ষ মেহন্নতি মানুষ

একমাত্র পুঁজিবাদ বিরোধী গণফ্রন্টই একে রুখতে পারে

গণদাবী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা | শনিবার, ১৮শে আশ্বিন, ১৩৫৬, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৯ | মূল্য—দুই আনা

চোখের ওপর ভেসে ওঠে কবছর আগেকার ছবি; সীমাহীন জনস্রোত। ঘরদোর বাড়ীঘর গ্রাম ছেড়ে চলেছে স্রোতের শেওলার মত অজানার পথে। চেনা নেই কোন সে পথ; জানা নেই কোথায় যেতে হবে। আহার নেই বিশ্রাম নেই; তবু যেতে হবে। পালাতে হবে দূরে শত্রুর নাগালের বাইরে। কেন তারা চলছে, তাদের এ দুর্দ্দশার জন্য দায়ী কে—এ সব কথা তখন মনে বাসা বাঁধতে পারে নি; শুধু তারা জানত শত্রুর নাগালের বাইরে পালাতে হবে। সুতরাং চলা আর চলা। পথ চলতে ক্লান্তিতে হয়ত পাদুটো জড়িয়ে যায়, অসহায় মুহূর্ত্তে হয়ত মনে প্রশ্ন জাগে—কেন এমন হল; সমাজের কাছে বিদ্রোহী মন হয়ত জবাব চাইতে চায় কিন্তু তার সুযোগ মেলে কৈ? মাথার ওপর গর্জে ওঠে সাইরেন; জানিয়ে দেয় শত্রু পক্ষের বোমারু বহরের উপস্থিতি। প্রাণ নিয়ে পালাও যদি বাঁচতে চাও। আবার চলা এর আর শেষ নেই। এমনি করে চলল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। কোটী জনতার তাজা প্রাণ নিয়ে, হাজার হাজার বছরের সভ্যতা আর সংস্কৃতির কেন্দ্রকে নস্যাৎ করে যুদ্ধ শেষ হল: পৃথিবী আবার হেসে উঠল। সর্বহারা মানুষ নতুন করে বাঁচার আশায় নব উদ্যমে গড়ে তুলতে লাগল হারাণ সব কিছু। তারা বাঁচতে চায়, তারা শান্তি চায় তারা পরিপূর্ণ শান্তিপূর্ণ জীবন উপভোগ করতে চায়; যুদ্ধ তারা চায় না। কিন্তু তবুও যুদ্ধ বাধাবার চক্রান্ত চলছে, নিজেদের মুনাফা ঠিক রাখার জন্য ছুরি শানাচ্ছে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীর দল; মেহন্নতী মানুষের তাজা রক্তে তাদের শোষণের ভিৎ তারা পাকা করে বাঁধতে চায়। আমরা তা হতে দেবনা, দেবনা—এই হল আমাদের প্রতিজ্ঞা। কিন্তু কেমন করে?

পুঁজিবাদী দুনিয়ার চূড়ান্ত সংকট

প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও শোষিত মানুষ এমনি আগ্রহ ভরে শান্তি চেয়েছিল, তবুও এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর অসংখ্য মানুষকে প্রাণদিতে হল। আবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা চলেছে। জনতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই ভাবে বার বার যুদ্ধ লাগান হচ্ছে। কিন্তু যারা লাগাচ্ছে আর কেনই বা? ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বাধলেও তার গোড়া পত্তন হয়েছিল তার অনেক আগে—প্রথম মহাযুদ্ধের পর পুঁজিবাদী দুনিয়ার সংকটের আরম্ভ হতে। ঠিক তেমনি সাম্রাজ্যবাদীরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবে বাধাবে তা বলতে না পারলেও তার প্রস্তুতি এখনই টের পাওয়া যাচ্ছে ভালভাবে। পুঁজিবাদী দুনিয়া তার সংকট কাটাবার উদ্দেশ্যে এই ভাবেই একটা যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই আর একটা বৃহত্তর যুদ্ধের প্রস্তুতিতে মেতে ওঠে। আজ ধনতান্ত্রিক সংকট চরমে উঠছে তাই যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ চাই ধ্বনিও উঠছে ফ্যাসিষ্টদস্যুদের তরফ হতে। ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের নেতা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র; পুঁজিবাদীদের মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালীও সে তবুও আজ তার স্বীকার না করে উপায় নেই—বিরাট সংকট তার অর্থনীতিকে গ্রাস করে ফেলতে বসেছে। মার্কিণ সরকারের নিজস্ব স্বীকৃতি থেকে জানতে পারা যাবে সেখানে বেকার সমস্যা কি রকম তীব্র ভাবে বেড়ে [illegible] পুঁ[illegible] বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ এবং শীঘ্রই হয়ত তা ১০ লাখে দাঁড়াবে। এর ওপর আছে ১৮০ লাখের মত অর্দ্ধ বেকার। যুদ্ধ পরবর্ত্তী সময়ের তুলনায় উৎপাদনও দ্রুতহারে কমে চলেছে। মার্চ হতে জুন এই কয় মাসে শিল্পোৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ কমেছে; ইস্পাৎ শিল্পে শতকরা ২৪.১ ভাগ হ্রাস পেয়েছে; হাজারে হাজারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লাল বাতি জ্বালছে আর বেকার সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলছে। ১৯৪৯ সালের প্রথমার্দ্ধেই ৪৫৮১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যবসা বন্ধ করেছে। অত্যুৎপাদন ও বাড়তি পুঁজির সমস্যার সমাধানের আশায় যে [illegible] পরিকল্পনা চালু করা [illegible] আমেরিকাকে বাঁচাতে পারল না। সাম্যবাদ বিরোধী যুদ্ধ শিবিরে পুঁজিবাদী দেশগুলিকে টেনে এনে আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

আবেদন

কংগ্রেসী ফ্যাসিষ্ট শাসনে ভারতীয় জনসাধারণের জীবন আজ সর্ব্বদিক দিয়া বিপন্ন; না আছে অন্ন, না আছে বস্ত্র, না মেলে মাথা গুঁজিবার জন্য এতটুকু স্থান। শুধু তাই নয় কংগ্রেসী দুর্নীতি ও দুঃশাসনী ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিবার উপায়ও নাই—জনতার কণ্ঠকে জোর করিয়া রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে অসংখ্য কালা কানুনের বাঁধনে। সভ্য নাগরিক জীবনের ন্যূনতম দাবী—স্বাধীন মত প্রকাশের দাবী জাতীয় নেতাদের রাম রাজত্বে অস্বীকৃত।

পুঁজিবাদী সরকারের এই চণ্ড নীতির সমর্থনে ঢাক পিটিতে নামিয়া গিয়াছে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা; কে কতটা পরিমাণে জনসাধারণের বক্তব্যকে ডুবাইয়া দিয়া সরকারের সাফাই গাহিতে পারে তাহারই প্রতিযোগীতা চলিতেছে। অবশ্য ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই; কারণ পুঁজিপতিদের সংবাদপত্র ত পুঁজিপতিদেরই স্বার্থ রক্ষা করিবে। তাই সাধারণের জীবনের কোন সমস্যারই কথা তাহাতে স্থান পায় না, পাইতে পারেও না।

জনতার কথা বলিতে পারে জনতার পত্রিকা। **গণদাবী** তাহার জন্ম হইতে মেহন্নতী, শোষিত মানুষের কথাই বলিয়া আসিতেছে; জনগণের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। তাই জনসাধারণের কাছে তাহার দাবীও আছে। সেই দাবী সে আজ করে—চাই অর্থ সাহায্য; চাই শক্তি দিয়া সাহায্য, চাই সর্ব্বরকমে সাহায্য ও সহযোগীতা।

হিন্দি সাপ্তাহিক—**'হামারা পথ'** এই মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে সংগ্রামী প্রগতিশীল জনতার সম্মুখে বাঁচার পথের সন্ধান দিবার উদ্দেশ্য লইয়া। তাহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আপনাদের সাহায্য একান্তভাবে অপরিহার্য্য। তাই সর্ব্বশেষে আপনাদের কাছে শোষিত শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত-দের নিজস্ব পত্রিকা, **"গণদাবী"** ও **"হামারা পথের"** শক্তিকে আরও শক্তিশালী করিবার জন্য গণদাবী ফাণ্ডে যথাসাধ্য সাহায্যের জন্য আবেদন জানাই।

রথিণ সেন
পরিচালক, গণদাবী
১এ, একজিবিসন রো, কলিকাতা ১৭।

কংগ্রেস আর, এস, এস, আঁতাত

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব লইয়াছেন—রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের সদস্যরা কংগ্রেসে ঢুকিতে পারিবে। বহু পূর্ব্ব হইতে গুজব রটিয়াছিল যে কংগ্রেসের সহিত আর. এস. এসের এক চুক্তি হইয়াছে। সেই চুক্তির জন্যই গুরু গোলওয়ালকারের মুক্তি, সেই চুক্তির ফলেই সংঘকে আবার আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড় করান, সেই চুক্তিকে সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে আর. এস. এসকে কংগ্রেসে আহ্বান। এতদিন নেতারা বলিয়া আসিতেছেন, ইহা গুজব; গুজবে বিশ্বাস করিও না। কিন্তু যেদিন কংগ্রেসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তিটি ঘোষণা করিলেন—"আর. এস. এসের কংগ্রেসের বাহিরে থাকা অপেক্ষা ভিতরে থাকা অনেক নিরাপদ", তখনই বোঝা গেল বাতাস কোন দিকে বহিতেছে। এতদিন সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটাইয়া কংগ্রেস আর. এস. এস আঁতাত পাকা হইল।

ওয়ার্কিং কমিটি যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়া কংগ্রেসের দ্বার সংঘের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছেন তাহার একটিও টিকে না। তাঁহাদের মতে আর. এস. এসের যখন কোন পৃথক রাজনৈতিক সত্বা নাই তখন এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের কংগ্রেসের সভ্য হইবার কোন বাধা নাই। উপরন্তু কংগ্রেসের সম্পাদক কালাবেঙ্কট রাও এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের যে ধারাটির উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যের সাফাই গাহিয়াছেন তাহা আরও চমৎকার। তিনি বলিয়াছেন, কোন ভারতবাসীকেই কংগ্রেসের সভ্য হইতে রোধ করা যায় না। অথচ কে না জানে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে এই মর্ম্মে একটি ধারা আছে যে, কেহ কংগ্রেসের মধ্যে সংগঠিত দল অথবা বিশেষ চিন্তায় বিশ্বাসী ঐক্যবদ্ধ 'গ্রুপ' হিসাবে থাকিতে পারিবে না। আর এস. এসের সভ্যরা কংগ্রেসের মধ্যে সংগঠিত বিশেষ চিন্তায় বিশ্বাসী উপদল হিসাবে থাকিবে কি? দ্বিতীয় বক্তব্য, সংঘের কোন রাজনৈতিক সত্বা নাই—এ কথাও ঠিক নয়। পৃথক কোন সত্বা যদি নাই থাকিত তাহা হইলে এতদিন কংগ্রেস হইতে পৃথক প্রতিষ্ঠান টিকাইয়া রাখার প্রয়োজন ছিল না; উপরন্তু কোন কাজই রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের জ্ঞান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত সময় যে কোন না কোন আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। সেই আদর্শই তাহার রাজনৈতিক চিন্তা। আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শ কি তাহা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। সুতরাং তাহার রাজনৈতিক সত্বাও তাঁহাদের জানা। যে রাজনৈতিক আদর্শকে কংগ্রেসের নেতারাই বহুবার বহুক্ষেত্রে নিন্দা করিয়াছেন। এখন তাহা রাতারাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, সংঘ পৃথক রাজনৈতিক সত্বাশূন্য হইয়া পড়িল কেন, গান্ধিভক্তদের গান্ধিহত্যাকারীদেরকে কোলে টানিতে কেন আপত্তি হইল না তাহা বুঝিতে হইলে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতবর্ষের নূতন শ্রেণী সম্বন্ধের পরিচয় লইতে হইবে।

"আর. এস. এসের আদর্শ নাৎসিদের আদর্শ"—পণ্ডিত জওহরলাল এই মত ব্যক্ত করিয়া আসিতেছিলেন। সেই নাৎসী আদর্শই আজ কংগ্রেসের আদর্শ। তাই আর. এস. এসের সহিত কংগ্রেসের মিলিতে আপত্তি নাই। কংগ্রেসের নেতৃত্ব এই দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতেই চিরদিনই ছিল এবং এখনও আছে। ক্ষমতা দখলের পূর্বে পুঁজিপতি শ্রেণীর এই অংশ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়াছিল যে গণশক্তির সাহায্য ব্যতীত ক্ষমতা দখল অসম্ভব। তাই তখন তাহারা জনস্বার্থ দরদীর অভিনয় করিয়াছে, জনস্বার্থের সমর্থনে বহু প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, ক্ষমতা হস্তগত করিতে পারিলে ভারতীয় শোষিত জনতার জন্য কি কি করিবে—কৃষক প্রজা মজদুররাজ প্রতিষ্ঠা তাহাদের লক্ষ্য—এই সমস্ত বিষয় ভাল ভাবে প্রচার করিয়াছে। এই কর্ম্মসূচীর পিছনে ভারতীয় মেহনতী জনসাধারণ বুকের রক্ত ঢালিয়াছে সুখে সচ্ছন্দে খাইয়া পরিয়া মানুষের মত বাঁচিবার আশায়। জনতার এই সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আপোষের মারফৎ ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ যখন ক্ষমতা হস্তগত করিলেন তখন তাঁহারা আগের প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম চাপিয়া গেলেন অধিকন্তু যেখানে গণশক্তি তাঁহাদের আগেকার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতে বাধ্য হইল সেইখানেই চলিল চণ্ডনীতির প্রয়োগ। নিছক শক্তির সাহায্যে এই সমস্ত গণস্বার্থ-সমর্থক প্রগতিবাদী আন্দোলনগুলি পিষিয়া মারিবার জন্য যত রকম গণতন্ত্র বিরোধী অস্ত্রের দরকার তাহার সব কয়টায় কংগ্রেসী সরকার ধীরে ধীরে নিজেকে সজ্জিত করিতেছে।

সারা বিশ্বের সামাজিক শক্তি আজ দুইটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে; এক-

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মধু ও হুল

নেতাদের ভাবভঙ্গি দেখে আর কথাবার্ত্তা শুনে সব কিছুর ওপরই যেন কেমন সন্দেহ জাগছে। পাঁজিতে বলে, এটা নাকি কলিকাল; আর দেশটার নাম যে ভারতবর্ষ—তা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবে না। অথচ সর্ব্ব ব্যাপারে সর্ব্বত্রই যে ভাবে রাম মাহাত্ম প্রচারিত হচ্ছে তাতে করে একে ত্রেতার কিচকিন্ধা রাজ ভাবা অন্যায় নয়! এতদিন তবু শুধু রাম মাহাত্ম ছিল এখন আবার আর একপদ বেড়েছে - রামচন্দ্রের পরমভক্ত হনুমান প্রশস্তি। বিশ্বাস না হয়, রাজাজীর বক্তৃতা পড়লেই দেখতে পাবেন তিনি বলেছেন—"আমার বিশেষ কিছু বলার নেই; কারণ শ্রীহনুমানই সব কিছু বলেছেন। আপনারা রামচন্দ্র ও হনুমানের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করুন।" সভ্য মানুষ বলেই না হনুমানজীর আদর্শ মানার অসুবিধা নয়ত আর আপত্তি কোথায়? তবে ভারতবর্ষের ভাগ্য যখন হনুমানজীর শ্রেষ্ঠ ভক্ত মাড়োয়ারী বণিকদের দয়ার ওপর নির্ভর করে, আর রাষ্ট্রযন্ত্র যখন তাঁদের বন্ধু বান্ধব ও শ্রীরামচন্দ্রের পুজারীদের করায়ত্ব তখন আমাদের যে হনুমান প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করে উপায় নেই—এ কথা একেবারে ঠিক। সাধনমার্গে উন্নতি করতে হলে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এ তিনটি থাকলে চলবে না; তাই না নেতারা শ্রীহনুমানের মত উলঙ্গ রাখার ব্যবস্থা করেছেন, আহারে অন্নের বদলে হনুমানপ্রিয় কলা খেতে উপদেশ দিচ্ছেন—পাকা কি কাঁচা অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তা অবশ্য বলেন নি; তবে পাকার যা দাম তাতে শেষেরটাই হবে — আর নেতাদের আত্মীয় পরিজনদের নির্ভয়ে কালো-বাজারীর সুবিধা দিচ্ছেন। এর পর হনুমানজীর শিষ্য হতে বাকি যেটা থাকে সেটা জনসাধারণ এখনও জোগাড় করে উঠতে পারে নি তাই নেতাদের কাছে আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন সেই অভাবটি পূরণ করে দেন। শুধু ত একটি লেজ; ওটা দেশের মাথারা পরলে দেশবাসীরও পরা হবে মায় কি বিড়লা ডালমিয়া শেঠজীরা খুসী হয়ে বেশী করে ভেটও দিতে পারে।

* * *

যারা বলে কংগ্রেসী শাসন কর্ত্তারা সব বিলাতী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন তারা যে একেবারে নির্জ্জলা মিথ্যাবাদী সে কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন আসামের প্রদেশপাল বাবু শ্রীপ্রকাশ। ইংরেজ আমলে উৎসবের দিনে ইংরেজ লাট বাহাদুরের দল বড় বড় অভিজাত হোটেল বা ক্লাবে দেশী ও বিদেশী মেম সাহেবদের সঙ্গে নাচতেন; সঙ্গে চলত বিলাতী সেরি, স্যাম্পেন ইত্যাদি জাতের পানীয়। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে তাই হোটেল আর ক্লাব ছেড়ে নেতারা নেমে এসেছেন খোলা মাঠে; দেশী বিদেশী মেমসাহেবদের স্থান দখল করেছে গ্রাম্য বা পাহাড়িয়া মেয়েরা আর সেরি স্যাম্পেন সম্বন্ধে কোন কিছু না শুনলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে সেখানে খাঁটি স্বদেশী নিজদেশে প্রস্তুত ছাপমারা কালীমার্কা পাট কিংবা মহুয়া হাড়িয়া চলে। এর সমর্থন পাবেন শ্রীপ্রকাশের এক পাহাড়িয়া মেয়ের সঙ্গে নাচের সংবাদে। Society girlরা এই সংবাদে ভীত হবেন না কেন না আটপৌরে ব্যবস্থা ত আর পালটায় নি—ক্লাব হোটেলে বল নাচ বন্ধ হবে না এ অবধারিত। তবে মোগলাই ভোজ খেয়ে খেয়ে অরুচি জন্মালে ডাক্তার বদ্যির উপদেশ মত লোকে তেতো সুক্তানিও খায় মুখ বদলের জন্য। এও সেই ব্যাপার আর কি।

* * *

টাকার দাম কমায় ক্ষতি যার সবচেয়ে বেশী হয়েছে তিনি হচ্ছেন একজন বড় আই, সি, এস, অফিসার। ভারত সরকারের ৯০ কোটি টাকা দিয়ে দুটি রাষ্ট্র-অধিকৃত ইস্পাত-কারখানা খোলার পরিকল্পনা ছিল। এর জন্যে যন্ত্রপাতি সব মার্কিন থেকে আসবে ঠিক ছিল। টাকার দামের তুলনায় ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় এখন সেই সব যন্ত্রপাতি আনার জন্যে খরচ লাগবে ১২০ কোটি টাকা। ভারতবর্ষের অর্থ সচিব জানিয়ে দিয়েছেন এ টাকা বর্ত্তমানে খরচ করা ভারতবর্ষের পক্ষে সাধ্যাতীত আর মার্কিন ছাড়া অন্য কোন দেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনা সম্ভব নয় বলে পরিকল্পনাটি বাতিল করে দেওয়া হল। ফলে ভারতবর্ষকে যন্ত্রপাতি জোগাবার Contractটি পাবার জন্য দুটি আমেরিকান ষ্টিল করপোরেশনের মধ্যে যে ভীষণ রেষারেষি চলছিল তারও অবসান হল। যে আই, সি, এস অফিসারটি এই বিষয়ে পাকা ব্যবস্থা করার কর্ত্তা তিনি উভয় কোম্পানীর কাছ থেকে মোটামুটি কিছু ভেট (ঘুষ নয়) নিচ্ছিলেন এবং এদের মধ্যে একপক্ষ অফিসারটির পুত্রের মার্কিণে পড়ার সমস্ত খরচই বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে বহন করছিল—তা নিশ্চয় এখন থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। কেন না বন্ধুত্বের মূল কারণটাই যখন দূর হল তখন বন্ধুত্ব রেখে লাভ কি? মুদ্রামূল্য হ্রাসে যে আই, সি, এস অফিসারের সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হল একথা অস্বীকার করার আর কি কোন উপায় আছে?

এল্‌বেনিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র

লেখক : এল্‌, সেদিন

যে দিনটি থেকে এলবেনিয়ায় নব্য গণতন্ত্রের জন্ম হোল, সেদিনটি থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের এলবেনিয়াকে ঘিরে চক্রান্তের আর অন্ত নেই। মাত্র দশ লক্ষ লোক নিয়ে কালকের ক্ষুদে এলবেনিয়া পুরো স্বাধীনভাবে সমাজতন্ত্রের পথে বীরের মত এগিয়ে চলেছে এটা তারা সইবে কি করে? কালতো তারাই ছিল বলকানের হর্তাকর্তা বিধাতা।

১৯৪৬ সালে প্যারীতে সন্ধিচুক্তি বৈঠকে গ্রীক রাজতন্ত্রী ফ্যাসিষ্টরা ব্রিটেন আর আমেরিকার উসকানিতে দাবী করেছিল যে এলবেনিয়াকে খণ্ডিত করা দরকার। সোবিয়েৎ প্রতিনিধিদল তাদের এই অক্রমণকে ব্যর্থ করে দেন।

তারপরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কর্ফু প্রণালীতে মাইনের ঘায়ে ব্রিটিশ জাহাজ ডোবাবার জন্য এলবেনিয়াকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে অপরাধী

তথাকথিত গ্রীক সমস্যার ব্যাপারে এলবেনিয়ার বিরুদ্ধে ইঙ্গ মার্কিণদের মনোবৃত্তির চরম নোংরামির পরিচয় পাওয়া গেল। গ্রীসের বিদেশী প্রভু এবং তাঁদের গ্রীক তাঁবেদারেরা গ্রীসের জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে নৃশংস যুদ্ধ চালাচ্ছে তার জন্য তারা এলবেনিয়ার উপর দায়িত্ব চাপাতে চায়। তারা বলতে চায় যে গ্রীক গেরিলাদের নাকি এলবেনিয়া থেকে সাহায্য করা হচ্ছে এবং সেইজন্যই সরকারী বাহিনী বার বার মার খাচ্ছে। আসলে ওয়াশিংটনের প্রভুদের অঢেল দাক্ষিণ্যও তাদের জনগণের ক্রোধের আগুন থেকে বাঁচাতে পারছেনা। আসলে এলবেনিয়ার জনগণের বিরুদ্ধে বিনা যুদ্ধ

প্যারীতে টিটোচক্রের দালাল মোজাপিয়াদের সঙ্গে গ্রীসের মন্ত্রী সালদারিস এক গুপ্ত চুক্তিতে এলবেনিয়াকে টুকরা করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু টিটোচক্র তখন এতটা এগুতে সাহস পায়নি। ব্যাপারটা তখনকার মত স্থগিত রেখে দিয়ে তারা মনে মনে আশা করেছিল যে ভবিষ্যতে এমন সুযোগ আসবে যখন গোটা এলবেনিয়াটাই তারা আত্মসাৎ করতে পারবে। এলবেনিয়াবাসীর সজাগ প্রহরার জন্য এই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। তাই নিস্ফল আক্রোশে টিটোচক্র আজ সব মুখোস খুলে ফেলে এলবেনিয়ার বিরুদ্ধে প্ররোচনা আরম্ভ করেছে। এলবেনিয় সীমান্তে প্রায়ই সশস্ত্র ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করেচে। ওদিকে চলেছে এলবেনিয়ার বিরুদ্ধে কুৎসার অভিযান।

[আলবেনিয়া আদ্রিয়াতিক সাগর তীরে একটী অত্যন্ত ছোট দেশ। ক্ষেত্রফল প্রায় ১১ হাজার বর্গমাইল; অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিম বাংলা প্রদেশের অর্দ্ধেকের ও অনেক কম। এর একদিকে যুগোশ্লাভিয়া অন্যদিকে গ্রীস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আলবেনিয়া ছিল ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে অনগ্রসর দেশ; কোন রেলপথই এই দেশে ছিল না। শুধু তাই নয় শিল্প বলতে আলবেনিয়ার নাম করারই মত কিছুই ছিল না; কৃষি ব্যবস্থারও অবস্থা তথৈবচ—সেই মান্ধাতার আমলের উপায়ে চাষবাস হত। মোট জন সংখ্যা ১০ লাখের মধ্যে সাড়ে ৮ লাখই ছিল নিরক্ষর। ১৯৩৯ সালে ইতালী এ দেশটি গ্রাস করে নেবার আগে এখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশ্য আলবেনিয়াকে ইতালীর হাতে তুলে দেবার কর্তা হন—বৃটীশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর দল। সোভিয়েট ইউনিয়নকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে যে কারণে জার্মানীর হাতে একে একে অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া তুলে দেওয়া হচ্ছিল সেই কারণেই আলবেনিয়াকে দিয়ে ইতালীকে সন্তুষ্ট করা হয়েছিল

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাকা যখন ঘুরে গেল, লাল ফৌজের অগ্রগতি আর দেশের মধ্যে প্রগতিশীল জনশক্তির অভ্যুত্থানে যখন ফ্যাসিষ্ট পদানত দেশ গুলি আবার মুক্ত হল তখন আলবেনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হল নয়া গণতন্ত্র। তার দেখতায় আলবেনিয়া আজ নতুন জীবন লাভ করেছে। রাজধানী তিরাণা ও ডুরাজোর মধ্যে রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আরও একটি পথ আবার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে; আলবেনিয়ার মোট চাহিদা ২ কোটী গজ কাপড় এখন দেশেই তৈরী হচ্ছে; তেল, ক্রোমিয়ান শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে এবং পাহাড়ে অঞ্চলের মধ্যে জলসেচের ব্যবস্থা করে ১৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার চাষের জমি বাড়ান হয়েছে। এখন আর মান্ধাতা আমলের কৃষি ব্যবস্থা প্রচলিত নয়; চাষ হচ্ছে কলের লাঙ্গলে। শিক্ষিতের সংখ্যা চার বছরের মধ্যেই শতকরা ১৫ ভাগ হতে শতকরা ৮৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

এ হেন ভাবে যে আলবেনিয়া এগুচ্ছে তার প্রতি ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রের লোভ এবং আক্রোশ ত থাকবেই। তাই ছুতানাতা করে তাকে জব্দ করা, বেআইনী ভাবে তার শিল্পাঞ্চলের ওপর বোমাবর্ষণ করা, মার্কিন পুঁজিপতিদের ভাড়াটে গ্রীক সৈন্যদের দিয়ে সীমান্তে হাঙ্গামা বাধিয়ে তার নামে দোষ চাপিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাকে যুদ্ধ-পিপাসী বলে প্রচার করা সমানেই চলছে। তবে একথাও ঠিক বর্তমান আলবেনিয়া পুরান আলবেনিয়া নয় আর আজ সে একাও নয়—তার পেছনে আছে গোটা বিশ্বের প্রগতিবাদী গণশক্তি; তাই সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত তাকে কাবু করতেও পারবে না।

—সম্পাদক, গণদাবী]

প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। ব্রিটিশরা গর্ব করে তাদের নাকি কৌতুকরস খুব বেশী। কিন্তু যখন তারা এই কথা প্রমাণ করার জন্য প্রাণভরে গলাবাজী ছুড়ে দিল, যে ক্ষুদ্র এলবেনিয়া বিশ্বশান্তিকে বিপন্ন করছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করছে তখন ব্রিটিশের কৌতুকরস সম্পর্কে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। ব্রিটিশের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বিচারালয় এলবেনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করতে সাহস পেল না। পৃথিবীর সামনে হাস্যাস্পদ কেই বা সাহস করে হতে চায়?

এলবেনিয়া শত্রুরা ইতিমধ্যে কোন সুযোগই ছাড়েনি তাকে বিপদে ফেলতে। তিরানায় ফ্যাসিষ্ট ধ্বংসবাদীদের বিচারে দেখা গেল যে এলবেনিয়ার বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্রের যোগসূত্র পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর কূটনৈতিক মিশনগুলোর সঙ্গে জড়িত। আমেরিকা আর ব্রিটেন এলবেনিয়াকে বিশ্বসভার সদস্য হওয়ার পথে বাধা দিতে লাগল।

ঘোষণায় এথেন্সের চক্রীদল যে আক্রমন চালাচ্ছে সেটাকে ঢাকবার জন্যই তাদের এলবেনিয়ার বিরুদ্ধে এই কুৎসা অভিযান। গত কয়েকবছর ধরে এমন একটিও সপ্তাহ যায়নি যে সপ্তাহে গ্রীক এলবেনীয় সীমান্তে রাজতন্ত্রী ফ্যাসিষ্টরা কোন না কোন প্ররোচনার কাজ করেনি। এলবেনিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী, বিশ্বসভার প্রধান সম্পাদক ট্রিগভীলীকে এক লিপিতে জানিয়েছেন—১৯৪৯ সালের প্রথম ৬ মাসে এইরকম ১৪৬টি সীমান্ত ঘটনা ঘটছে। এই সব প্ররোচনার ২টি কারণ। একটা হল নিজেদের দেশবাসীর কাছে হার মানার মিথ্যা কারণ তৈরী করা আর একটি হোল এলবেনিয়ার সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এইরূপে জোর করে বলকান অঞ্চলে অশান্তির সৃষ্টি করে ছোট ছোট প্ররোচনা থেকে বড় বড় প্ররোচনার দিকে এগিয়ে যাবে, এই হল আসল কথা। টিটোচক্রের বিশ্বাসঘাতকতা এই পথকে সহজ করে দেবে এই তাদের আশা।

আজকে জানা গিয়েছে যে ১৯৪৭ সালেই

আজ এলবেনিয়ার বিরুদ্ধে প্ররোচনা চলেছে উত্তর এবং দক্ষিণ থেকে। গত ২রা আগষ্ট, এথেন্সের তিনটি গোলন্দাজবাহিনী ১৫ খানা স্পিটফায়ার বিমান নিয়ে এলবেনিয়ার সীমান্তে অনধিকার প্রবেশ করেছিল বর্ঝিগ্রাদ অঞ্চলে। ভিদোহোভ গ্রামের ওপর বর্ষিত হোল তাদের গোলা। সাত ঘণ্টা লড়াইএর পর তারা এলবেনিয়া থেকে পালাতে বাধ্য হোল। ৪ঠা এবং ৫ই আগষ্ট আবার এই ধরণের আক্রমণ হোল এবং এলবেনিয়ার ওপর ১৫শো গোলা ফেলা হোল। ৯ই আগষ্ট আরো প্রায় হাজারখানেক গোলা পড়ল। ১১ই আগষ্ট তিনখানা গ্রীক বিমান থেকে এলবেনিয়ার সীমান্তে কতকগুলো গ্রামের ওপর বোমা ফেলা হোল। উত্তর সীমান্তেও এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে।

এলবেনিয়ার এই ব্যাপার নিয়ে বিশ্বসভার কাছে প্রতিবাদকে কুখ্যাত "বলকান কমিশন" প্রত্যাখ্যান করেছে।

এলবেনিয়ার উপর এই সব হামলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে এথেন্সের সংবাদপত্রগুলোর তর্জনগর্জন।

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মিলন ক্ষেত্র কংগ্রেস

(২য় পৃষ্ঠার পর)

দিকে রহিয়াছে বিশ্বের প্রগতিবাদী গণতন্ত্রী, সমাজতান্ত্রিক গণশক্তি অন্যদিকে পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদীরা। বর্তমানের এই চূড়ান্ত শ্রেণীবিন্যাসের সময় পুঁজিপতিরা পূর্ব্বে যেমন গণতন্ত্রের মুখোসটি পরিয়া শোষণ চালাইত সেই আবরণটুকুও রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তাই এখনকার পুঁজিবাদীদের ফ্যাসিষ্ট না হইয়া উপায় নাই। কিন্তু ফ্যাসিবাদ বলিতে যদি কেহ বুঝিয়া থাকে নিছক গায়ের জোরে শাসন তাহারা চালাইবে, কোন রকম সংস্কারের ধার দিয়াও যাইবে না তাহা হইলে ভুল করা হইবে। তথাকথিত গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দেশগুলিতে চিলেমী ও পুঁজিপতিদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় তাহাকে ফ্যাসিষ্টরা প্ল্যানিং এর মারফৎ আয়ত্বে আনিতে চায়। এই প্ল্যানিং এর উদ্দেশ্য হইল যেমন পুঁজিবাদকে বাঁচাইবার জন্য তাহার দুর্বলতাকে দূর করা (ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের অবাধ প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা কিছুটা কাটিয়াও) অন্যদিকে জনতার ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষকে চাপা দিবার উদ্দেশ্য অল্প কিছু সুযোগ সুবিধা দান, উগ্র জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিপ্লবী আন্দোলনের পথ হইতে সরাইয়া আনা। একদিকে তাহাদের লক্ষ্য যত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দেশের মধ্যে আছে তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া সবল বিপ্লববিরোধী এমন কি বুর্জোয়া গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিতে পরিণত করা অন্যদিকে বিপ্লবী শক্তিসমূহকে চণ্ডনীতির আক্রমণে চুরমার করিয়া দেওয়া। ভারতীয় রাষ্ট্র ফ্যাসিবাদের পথ ধরিয়া আগাইতেছে। তাই একদিকে যত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ভারতবর্ষে আছে তাহাদিগকে ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে স্থান দিয়া তাহাকে শক্তিশালী ফ্যাসিষ্ট শক্তিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চলিতেছে অন্যদিকে যত প্রগতিবাদী শক্তি আছে তাহাদিগকে অর্ডিন্যান্স আর বে-আইনী কালাকানুনের সাহায্যে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মঘট বে-আইনী হইয়াছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাই, সভাসমিতি ও স্বাধীন মত প্রকাশের প্রাথমিক অধিকারটুকুও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, বিনা কারণে ও বিনা বিচারে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রকর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করা হইতেছে, ব্যালট বাক্স ভাঙ্গিয়া, মাথা ফাটাইয়া উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস বিরোধীদের পরাজয় করার চেষ্টা হইতেছে। আরও অনেক কিছু হইতেছে।

হিটলারের অভ্যুত্থানের পর জার্ম্মাণীতেও এই ভাবে ফ্যাসিষ্ট সংঘ শক্তি গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচার, জাতির অতীত বীরত্বের দোহাই পাড়া, সমস্ত প্রগতিবাদী মতবাদ ও আন্দোলনকে জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী বলিয়া নির্বিচারে সর্ব্বপ্রকার উপায়ে দমন, ইহুদী বিদ্বেষ প্রচার তাহার রূপ। আমেরিকায় ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের নিগ্রো বিদ্বেষ ও হত্যা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার বর্ণ-বিদ্বেষ—এই সবই ফ্যাসিবাদের বহিঃপ্রকাশ। ভারতবর্ষও পিছাইয়া নাই। উগ্র জাতীয়তা প্রচার করিয়া টাটা বিড়লার তাঁবেদারী, বর্ণ বিদ্বেষ প্রচারের সাহায্য সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক দাঙ্গা বাধান, পাঞ্জাবের উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী প্রার্থীর সভাসমিতি ও মাথা এই স্বয়ং সেবক সংঘের সদস্যরা ভাঙ্গিয়াছে, আগামী নির্ব্বাচনে তাহাদিগকে সেই কাজে আবার নিয়োগ, সাম্যবাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, সাম্যবাদীদের পিটাইয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা—এই সব কাজ ফ্যাসিষ্টদের কায়দায় গঠিত আর এস. এস সভ্যদের দ্বারা ভালভাবে করান যাইবে। সুতরাং তাহাদিগকে কংগ্রেসে লওয়া হইতেছে।

উপরন্তু আর, এস, এসের সর্ব্বাধিনায়ক গুরু গোলওয়ালকার পরিষ্কার জানাইয়া দিয়াছেন—১। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন অযৌক্তিক, ২। দেশের শিল্পকে জাতীয় করণের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া যায় না ৩। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ তিনি চান না ৪। গণতন্ত্র ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারে তিনি বিশ্বাস করেন না। সুতরাং এ হেন নেতাকে কংগ্রেসের ভিতরে স্থান দিলে প্রতিক্রিয়ার শক্তি ত বাড়িবেই বিশেষ করিয়া পিছনে যখন একটি শক্তিশালী ফ্যাসিষ্ট সংগঠন আছে। আর, এস, এস-ই হইবে নাৎসী জার্ম্মাণীর এস, এস, আর্ম্মীর মত কংগ্রেসী এস এস, আর্ম্মী।

আজ আর. এস. এস আসিয়াছে, কাল আকালী দল আসিবে, তাহার পরের দিন আসিবে হিন্দুমহাসভা, মোসলেম লীগের চাঁইরা নাম বদলাইয়া ত অনেক আগেই কংগ্রেসে নাম লিখাইয়াছেন—এইভাবে একের পর এক প্রতিক্রিয়ার যতগুলি বিচ্ছিন্ন অংশ আছে সকলেরই স্থান হইবে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে। ইহা বুঝিবার কোন অসুবিধা নাই। দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল আন্তর্জাতিক অবস্থা ও দেশের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধনশীল জনতার অসন্তোষকে দাবাইতে হইলে বিশেষ করিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্যাসিবাদী শিবিরকে শক্তিশালী করিতে হইলে প্রতিক্রিয়ার ঐক্য ফ্রন্ট গড়া ভিন্ন উপায় নাই—ইহা ভারতীয় টাটা বিড়লা গোষ্ঠি ও তাহাদের রাষ্ট্র বোঝে। তাই তাহার চেষ্টা হইতেছে। অথচ জনতা যদি এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হইয়া শুধু দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহাকেও পস্তাইতে হইবে পরে, যেমন করিয়া পস্তাইতে হইতেছে জার্ম্মাণ জনসাধারণকে। প্রতিক্রিয়ার এই ঐক্যবদ্ধতা গণশক্তির সম্মুখে এক মুহূর্ত্তও টিকিতে পারে না তবে যদি সে গণশক্তি ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হয়। সেই ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত গণফ্রন্ট গঠনই শোষিত মেহনতী জনতার দায়িত্ব। নিজ নিজ অঞ্চলে শোষিত জনতার শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্তের সংগ্রামী বামপন্থী মোর্চা গঠন করিয়া নবগঠিত প্রতিক্রিয়ার দুর্গকে সবল হইবার পূর্ব্বেই ধ্বংস করুন। ধ্বংসের অস্ত্র হইল—জনসাধারণের নিজস্ব সংগ্রামী সংগঠন।

ই, আই, রেলএ ছাঁটাই

বিনা কারণে ৪২ জন কর্ম্মচারী বরখাস্ত

পূর্ব্ব চিহ্নিত পরিকল্পনার প্রথম কোপ

সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি রেল বিভাগ হইতে ৫০ হাজার শ্রমিক ও কর্মচারীকে ছাঁটাইএর সুপারিশ করিয়াছে। এই পরিকল্পনার প্রথম কিস্তি হিসাবে ই. আই. রেলের একাউন্টস বিভাগের ৪২ জন কর্মচারীর উপর ছাঁটাইএর নোটিশ জারী করা হইয়াছে। ছাঁটাই কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেরই চাকুরী দেড় বৎসরেরও বেশী।

ছাঁটাইএর নোটিশে কোন কারণ দেখান হয় নাই। পূজার পূর্ব্ব পর্যন্ত এই সমস্ত কর্মচারী স্বাভাবিকভাবে কাজ করেন; কিন্তু পূজার বন্ধের পর ৮ই অক্টোবর আফস খুলিলে তাঁহাদিগকে জানান হয় যে তাঁহাদিগকে ১লা অক্টোবর হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

এই জুলুমের প্রতিবাদে ফেয়ারলি প্লেসের একাউন্টস্ বিভাগ কাজ করিতে অস্বীকার করে এবং সারাদিন ঐ বিভাগের কাজ বন্ধ থাকে।

সংবাদে প্রকাশ জেনারেল ম্যানেজারের সহিত এই সম্পর্কে দেখা করিলে তিনি জানান যে, তাঁহার আদেশ চূড়ান্ত এবং এই বিষয়ে কিছু করাই হইবে না।

সংঘবদ্ধতার জোরে

একশত ছাঁটাই শ্রমিকের পুনর্নিয়োগ ও বোনাস আদায়

শ্রীরামপুর অঞ্চলে সুতাকল শ্রমিকদের উপর বহুদিন হইতে নির্য্যাতন চলিয়া আসিতেছিল। একদিকে বিনা কারণে মিথ্যা অজুহাতে মালিক শ্রমিকদিগকে ছাঁটাই করিতে চেষ্টা করিতেছিল অন্যদিকে মালিকের এই অন্যায় অত্যাচারের পিছনে সরকারী সাহায্য পূর্ণ মাত্রায় চলিয়া আসিতেছিল। সরকারী সাহায্য সম্প্রতি এমন চরম অবস্থায় ওঠে যে আইন সঙ্গত ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই অবস্থার সুযোগে মাহেশের বেঙ্গল বেল্টিং মিলের কর্তৃপক্ষ ১০০ জন শ্রমিকের উপর ছাঁটাই এর নোটিশ দেয়। ইহাতে শ্রমিকরা উত্তেজিত হইয়া ওঠে এবং ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কয়েক ঘণ্টা অবস্থান ধর্ম্মঘটের পর এই ছাঁটাই নোটিশ প্রত্যাহার করিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়।

লাভ হয় না, মিলে কাপড় জমিয়া গিয়াছে এই সব অজুহাতে মালিক পক্ষ সরকারী শালিসীর রায়—বোনাস দিতে হইবে—অস্বীকার করিলেও সরকার পক্ষ মালিকের হইয়া সর্ব্বরকমে সাহায্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে মালিক পক্ষ আংশিকভাবে বোনাসের দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

দেবেন সেনের দালালী

স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট কোম্পানীর শ্রমিকদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা

১৩৭ জন শ্রমিক ও কর্ম্মচারীকে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট ওয়ার্কসএর শ্রমিক ও কর্মচারীরা ধর্ম্মঘট দাবী করিলে আই. এন. টি. ইউ. সি নেতা দেবেন সেন বাধ্য হইয়া ধর্ম্মঘট প্রস্তাবে রাজী হন। কিন্তু ২২দিন ধর্ম্মঘট সফল ভাবে চলার পরও শ্রমিক কর্ম্মচারীদের সংগ্রামী মনোভাবের কোন পরিবর্তন না দেখিয়াও দেবেন বাবু কোন এক অজ্ঞাত কারণে সাধারণ সভ্যদের অগ্রাহ্য করিয়া ৩০শে আগষ্ট রাত্রি ১০টার সময় কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তি করিয়া ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করেন।

চুক্তিগুলির মধ্যে প্রধান হইল—(১)—১লা সেপ্টেম্বর হইতে সকলে কাজে যোগ দিবে (২ — ১৩৭ জন ছাঁটাই শ্রমিক কর্ম্মচারীর মধ্যে কেবলমাত্র তুলিয়া দেওয়া ষ্ট্রিকনিন ডিপার্টমেন্টের লোক এবং আরও ৩জনকে ছাড়া সকলকে লওয়া হইবে, (৩)— এই ছাঁটাই লোকদের পুনর্নিয়োগের জন্য সমস্ত শ্রমিক ও অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের কাজের ঘণ্টা কমাইয়া দেওয়া হইবে এবং সেই অনুযায়ী মাহিনা কাটা হইবে, (৪)—উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে শ্রমিকদের (৫)—ধর্ম্মঘটের সময়ের কোন মাহিনা মিলিবেনা।

ইহাতে শ্রমিকদের কোন দাবীই স্বীকৃত হয় নাই। ধর্ম্মঘট চলাকালীন অবস্থায় বহু শ্রমিক কর্ম্মচারীই বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন অথচ ৩০শে আগষ্ট চুক্তি হইল ১লা সেপ্টেম্বর সকলকে যোগ দিতে হইবে। ইহাতে বহু শ্রমিকই সময় মত অফিসে যোগ দিতে পারে নাই এবং ইহার জন্য তাহাদের বেতন ও কাটা গিয়াছে অথচ কথা ছিল উহা ছুটির সহিত adjusted হইবে। ছাঁটাই কর্ম্মচারীদের ৩৪ জন ছাড়া আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও লওয়া হয় নাই। আর আগষ্ট মাসের সাড়ে নয় দিনের বেতন লইয়া সকলকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। ধর্ম্মঘটের পর শ্রমিক কর্ম্মচারীদের উপর নিত্য নব জুলুম বাড়িয়াই চলিতেছে—কথায় কথায় কাজের দোষ ধরিয়া গালাগালি চলিতেছে, Standing order এর জোরে পাশের সহকর্মীর সহিত কাজের কথা বলিলেও এবং জরুরী কাজে ডিপার্টমেন্টের বাহিরে গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

এই ব্যবহারে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা আই. এন. টি. ইউ সির প্রকৃত রূপ চিনিয়া লইয়াছে। দেবেনবাবু ধর্ম্মঘটের সময় বড় বড় কথা বলিয়া, আগামী নির্ব্বাচনে তাঁহাদিগকে ভোট দিবার উপদেশ দিয়া, বামপন্থী প্রার্থীদের একেবারে শেষ করিবার দাবী করিয়া এবং সাধারণ শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের অজ্ঞতা ও তাঁহার উপর ভুল বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া সাহেবের সহিত শ্রমিক কর্ম্মচারী স্বার্থ বিরোধী চুক্তি করিয়া সেই যে গিয়াছেন তাহার পর আর সাধারণ শ্রমিক কর্ম্মচারীদের সম্মুখে আসিতে সাহস পান নাই। স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট শ্রমিক কর্ম্মচারী ভাইরা আই, এন, টি, ইউ, সির মোহ কাটাইয়া নিজেদের জঙ্গী সংগঠন গড়িতে পারিলে তবেই এই অত্যাচারের প্রতিকার করিতে পারেন। অন্য কিছুতে নয়।

কেদারনাথ জুট মিলের

শ্রমিকের উপর পুলিশী নির্য্যাতন

মেয়েদের চুল ধরিয়া নির্দ্দয় প্রহার

হাওড়ার কেদারনাথ জুট মিলের ২০০০ শ্রমিক আজ দেড়মাস ধরিয়া ধর্ম্মঘট করিয়া আছে। বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াও যখন ধর্ম্মঘট ভাঙ্গা সম্ভব হইল না তখন জঙ্গী শ্রমিকদের মারপিট, গ্রেপ্তার প্রভৃতি নির্য্যাতন চলিল সমানে। তাহাতেও সফল না হইয়া সরকার ১৪৪ ধারা জারী করিয়া মালিককে দালাল শ্রমিক দিয়া কাজ চালাইবার সুবিধা করিয়া দেয়। পুরাতন শ্রমিকরা দালালদের বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলে দালালরা ফিরিয়া যায়; কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী লইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং শান্ত শ্রমিকদের নির্বিচারে নির্দয় প্রহার করিতে আদেশ দেন। ফলে বেপরোয়াভাবে লাঠি চালাইয়া বহু শ্রমিককে সাংঘাতিকভাবে আহত করা হয়, মেয়ে শ্রমিকদের চুলের মুঠি ধরিয়া রাস্তার উপর দিয়া ছেঁচড়াইতে ছেঁচড়াইতে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাহাদিগকে প্রিজনভ্যানের মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। শুধু তাহাই নয় শ্রমিক বস্তিতে ঢুকিয়াও মারপিট করা হয়।

সংবাদে প্রকাশ পুলিশ বিভাগের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী শ্রীসুশীল ব্যানার্জী ইউনিয়নের সভাপতি। তাঁহার কথা না শুনিয়া শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করার জন্য শ্রমিকদিগকে এইরূপ প্রতিশোধমূলকভাবে প্রহার করা হইয়াছে।

কমরেড গোবিন্দ দে গ্রেপ্তার

পোষ্টাল লোয়ার গ্রেড ষ্টাফের উপর পুলিশী জুলুম

গত ১০ই অক্টোবর পোষ্টাল লোয়ার গ্রেড কর্ম্মচারীরা রিলিফ প্রথা রদ ও অন্যান্য দাবীর সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের অফিসে যান। পি এম, জি তাঁহাদের সমস্ত কথা শুনিবার আশ্বাস দিয়া অপেক্ষা করিতে বলেন এবং ইতিমধ্যে পুলিশে খবর দিয়া যখন তাঁহারা আলাপ আলোচনা চালাইতেছিলেন তখন তাঁহাদিগকে ধরাইয়া দেন। লোয়ার গ্রেড কর্ম্মচারীদের নেতা কমরেড গোবিন্দ দে সমেত অন্যান্য কর্মীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

লোয়ার গ্রেড ষ্টাফের উপর এই ধরণের জুলুম নূতন নয়। অথচ ইহার প্রতিকারও হইতেছে না; তাহার প্রধান কারণ কর্ম্মচারীদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা এবং তাঁহাদের নিজস্ব জঙ্গী সংগঠনের অভাব। ইউনিয়ন প্রকৃত পক্ষে আজ পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীদের হইয়া কিছু করে নাই শুধু কেমন করিয়া সাধারণ কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জয়প্রকাশ কিংবা সাকসেনার অধীনে টানিয়া আনা যায় তাহারই চেষ্টা করিতেছে। জয়প্রকাশ ও সাকসেনা কেহই কর্ম্মচারীদের হইয়া সংগ্রামে আগ্রহশীল নহেন; কেমন করিয়া নিজেদের নেতৃত্ব টিকাইয়া রাখিয়া সরকারের নিকট মঞ্জীত বা ঐ ধরণের কোন বিষয় দর দস্তুর করা যায় তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। এই জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের ইহাই কাজ। এ অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে নিজেদের সংগ্রাম কমিটি গড়ুন এবং তাহার নেতৃত্বে সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধতার আওয়াজ তুলুন।

পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সাপ্লাই বিভাগে ছাঁটাই

কোন কারণ না দেখাইয়া ৪ জনকে বরখাস্ত

পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসী সরকার এতদিন প্রচার করিয়া আসিতেছিল, যাহারা কম্যুনিষ্ট কিংবা কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন তাহাদিগকেই সিভিল সাপ্লাই বিভাগ হইতে ছাঁটাই করা হইয়াছে; যেহেতু তাহারা সরকারের খাদ্যনীতিকে বানচাল করিয়া দিতে চায়। এই নীতির ফলে অফিসগুলিতে কর্মচারীদের বিষয় গোয়েন্দাগিরি পুরাদমে চলে এবং বহু কর্মচারীকেই বিনা কারণে ছাঁটাই করা হয়। কর্ম্মচারীদের দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় যদি সরকারের ধনিক তোষণ ও চোরাকারবারী পোষণ নীতির সমর্থক না হয় তাহা হইলে তাহাও ছাঁটাইএর অজুহাত হিসাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমানে কোন কারণ না দর্শাইয়াই ছাঁটাই চলিতেছে। ১। শ্রীসুবোধ চ্যাটার্জী, ২। শ্রীশচীন অধিকারী, ৩। শ্রীঅসীম চক্রবর্ত্তী ও ৪। শ্রীনির্মল সিংহকে এইভাবে বিনা কারণে এবং ইঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না আনিয়াই বরখাস্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ইউনিয়নের সভ্য নন এমন লোকও আছেন। তথাপি তাঁহাদের নিষ্কৃতি মিলে নাই। বর্ত্তমান সরকারের নীতিই হইতেছে—যে কোন অজুহাতে এবং বিনা কারণে ছাঁটাই করা। ইহাকে প্রতিরোধ করিতে হইলে কর্মচারীদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

বাস্তহারাদের উপর জুলুম

টাকা লইয়াও জমিদারের রসিদ দিতে অস্বীকৃতি

সরকারী অবহেলায় এক ব্যক্তির অনাহারে মৃত্যু

নদীয়া জিলার গোবরা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত নচর নামক গ্রামে, প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল, ১৫০টি বাস্তহারা পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐ স্থানের জমিদার বটু ভট্টাচার্য্যকে বিঘা প্রতি ৯৫৲ টাকা হারে সেলামী দিয়া তাহারা কুড়ে ঘর তুলিয়া বসবাস করিতে থাকে। অথচ এখনও পর্য্যন্ত তাহাদিগকে জায়গার আমলনামা বা খাজনার চেক দেওয়া হয় নাই। বাস্তহারারা বারবার উহা চাওয়া সত্ত্বেও তাহাদিগকে চেক দেওয়া হয় নাই এমন কি বেশী কিছু বলিলে জোর করিয়া তুলিয়া দিবার ভয় পর্য্যন্ত দেখান হইয়াছে। প্রায় ১লক্ষ টাকা সেলামী দিয়াও বাস্তহারারা কোন সত্ত্বেও অধিকারী নয়। উপরন্তু বহু পরিবার অনাহারে দিন কাটাইতেছে; সরকারকে বহুবার জানান হয় যে এক ব্যক্তির অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহার পর কৃষ্ণনগরের রিলিফ অফিসার উক্ত সেন্টারটি পরিদর্শনের জন্য আসেন। তাঁহাকে সমস্ত বিষয় অবগত করান হয় এবং আর একজন বাস্তহারা অনাহারে মরনোন্মুখ তাহা তাঁহাকে জানান হয় এবং লোকটিকে দেখান হয়। কিন্তু তিনি কাহাকেও কোন রিলিফ দিতে অস্বীকার করেন।

ছাঁটাই, মজুরী হ্রাস ও শ্রম বৃদ্ধি

চটকল মজদুর ভাইদের উপর নূতন আক্রমন

সংগ্রামী সংগঠন ও ঐক্যবদ্ধতা একমাত্র বাঁচাইতে পারে

বাংলার ৩ লক্ষ চটকল মজদুর ভাইদের উপর আবার নূতন করিয়া আক্রমণ চলিতে যাইতেছে। এখন হইতেই ইহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত না হইলে বাঁচিবার কোন উপায় নাই। মজদুর ভাইদের বুঝিতে হইবে, যে কংগ্রেসী সরকার ও মালিকের চক্রান্তে তাহাদের উপর নিত্য নূতন আক্রমণ চলিতেছে সেই মালিক ও কংগ্রেসের সংগঠন আই. এন. টি. ইউ. সি. তাহাদের কোন দিনই ভাল চোখে দেখিতে পারে না। মালিকের টাকায় মালিকের সাহায্যে আই. এন. টি. ইউ. সির ইউনিয়ন কারখানায় কারখানায় গড়িয়া উঠিয়াছে। যে ইউনিয়ন মালিক গড়ে সেই ইউনিয়ন কি শ্রমিকের দুঃখ দূর করিবার জন্য হয়, না মালিকের স্বার্থরক্ষার জন্য মজদুর ভাইকে ভুল বোঝাইবার জন্য হয়? বাঁচিতে হইলে, নূতন আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতে হইলে আই এন. টি. ইউ. সিকে ত্যাগ করিয়া নিজেদের জঙ্গী সংগঠন গড়ুন, নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা আনুন এবং সংগ্রাম করুন। তবে জয় হইবে।

গত ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে চটকল শিল্পের ট্রাইব্যুনালের রায়ের মেয়াদ শেষ হইয়াছে; শ্রমিক ভাইরাও সংগঠিত নয়। তাই মালিকপক্ষ নূতন করিয়া আক্রমণের উদ্যোগে করিতেছে। তাহারা প্রকাশ্যেই জানাইয়া দিয়াছে—

১। ট্রাইব্যুনালের রায়ে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুয়িটি, বেতনসহ ছুটি প্রভৃতি যে সমস্ত সুবিধা দিবার কথা ছিল তাহা আর দেওয়া হইবে না;

২। মাসে যে এক সপ্তাহ করিয়া কারখানা বন্ধ রাখা হইত এবং এই বন্ধের জন্য স্থায়ী মজুরকে অর্দ্ধ মজুরী ও বদলীওয়ালাকে যে ২৲ টাকা করিয়া রোজ দেওয়া হইত তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে;

৩। আবার মোট কাজ শতকরা ২৫ ভাগ কমান হইবে এবং শ্রমিক ছাঁটাই করা হইবে;

৪। টাকার দাম কমিয়া যাওয়ায় এবং কাঁচা পাট পাকিস্তান হইতে আনিতে বেশী খরচ পড়ায় শ্রমিকের মজুরী কমাইয়া ও শ্রমশক্তি বাড়াইয়া দাম ঠিক রাখিতে হইবে।

একে ত চটকল শিল্পের ট্রাইব্যুনালের রায়ে চটকল মজুরদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল তাহার উপর এখন সেই রায়ে স্বীকৃত প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি সুবিধাগুলি হইতে শ্রমিকদিগকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ গত বৎসর ট্রাইব্যুনাল চলাকালীন অবস্থায় জীবন ধারণের ব্যয় সূচক সংখ্যা যত ছিল আজ তাহা হইতে আরও ৫০ পয়েন্টের মত বৃদ্ধি পাইয়াছে অথচ মাসে এক সপ্তাহ কারখানা বন্ধ করিয়া মজুরী শতকরা ২৫ ভাগ কাটার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ইতিপূর্ব্বে পাটকলগুলিতে ৩০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হইয়াছে; নূতন করিয়া আরও ৫০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করার ব্যবস্থা হইয়াছে। টাকার দাম কমাইবার ফলে শ্রমিকদের খাইবার খরচ ইতিমধ্যেই বাড়িয়াছে আরও অনেক বাড়িবেই বাড়িবে অথচ নিজেদের মুনাফা ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে বিড়লা-ওয়াকার গোষ্ঠি শ্রমিকের মজুরী কমাইবার ও তাহাদের শ্রমের পরিমান বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

পশ্চিম বাংলার চটকলগুলির শতকরা ৯০টির বেশী ইংরাজ কোম্পানীর এবং তাহাতে লাভের পরিমানও অচিন্তানীয়। ইংরাজ ও ভারতীয় পূঁজিপতিদের সেই লুণ্ঠনকে ঠিক রাখিবার জন্য কংগ্রেসী সরকার তাহাদের পিছনে সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী লইয়া হাজিরা দিতেছে। এই অবস্থায় এই অন্যায় জুলুমের প্রতিকারের আশা কংগ্রেসী সরকারের নিকট হইতে করা বাতুলতা। জঙ্গী সংগঠন ও তাহার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই বাঁচার একমাত্র পথ। তাই আওয়াজ তুলুন—

১। জীবনধারণের খরচ অনুযায়ী মজুরী দিতে হইবে;

২। কল বন্ধ থাকার সময় পূরা বেতন চাই;

৩। কোন ছাঁটাই চলিবে না;

৪। ছাঁটাই শ্রমিককে পুনর্বহাল করিতে হইবে;

৫। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, বোনাস, গ্র্যাচুয়িটি, শিক্ষাবোনাস প্রভৃতি দিতে হইবে এই আওয়াজের পিছনে প্রাদেশিকতামুক্ত সংগ্রামী ঐক্য ও জঙ্গী সংগঠন গড়িয়া তুলুন।

জনতার সুখে থাকার লক্ষণ

পিতা কর্ত্তৃক দুই পুত্রকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ

পরিবার ভরণপোষণের অক্ষমতার পরিণতি

কংগ্রেসী আমলে লাভ যদি কাহারও হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা জনসাধারণেরই হইয়াছে—এই ধরণের কথা মহামান্য বড়লাট বাহাদুর হইতে ছোট বড় কংগ্রেসী নেতা উপনেতারাও বলিয়া আসিতেছেন। অথচ জনতার লাভ হওয়া দূরে থাকুক তাহাদের জীবন লইয়া টানাটানিই চলিতেছে প্রত্যহ। লাভের কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু বাঁচিবার জন্য একান্ত ভাবেই দরকার অন্নবস্ত্রের। সেই অন্নবস্ত্রই মেলে না কংগ্রেসী রামরাজত্বে। পরিবার পোষণে অক্ষম পিতামাতা আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি খুঁজিতেছে, পুত্রকন্যাকে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে এইরূপ সংবাদ কংগ্রেসী জয়ঢাক তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিও পরিবেষণ না করিয়া পারে না। রাজকোটে আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছে—পরিবার পোষণের অক্ষমতায় সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া এক ব্যক্তি তাহার দুই পুত্রকে এক কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করে। তাহাদের একজন মারা গিয়াছে: অন্য জনকে উদ্ধার করা হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসন বিচারে উক্ত ব্যক্তির হয়ত হত্যার অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদী শাস্তি হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য পিতা হইয়া পুত্রকে এইভাবে হত্যা কেন করিতে হয়? জীবনে কত বড় আঘাত আসিলে, বাঁচিবার পথ কি রকম রুদ্ধ দেখিলে মানুষ এইরূপ উপায় অবলম্বন করে তাহা কি নেতারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? তাঁহাদের উহা ভাবিবার সময় কোথায়? এই একান্ত নিঃস্ব ভারতবাসীরা ত তাঁহাদের কেহ নয়; তাই তাহারা মরিলেই বা কি বাঁচিলেই বা কি? পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্র কোন নৈতিক দায়িত্ব বোধ করে না এই সব বেকার ভারতবাসীকে কাজ দিবার অথচ সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলিলে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে শাস্তি পাইতে হইবে। যে রাষ্ট্র জনতাকে দেখে না তাহাকে জনসাধারণত দেখিবেই না বরং তাহাকে উৎখাত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে জনরাষ্ট্র কায়েম করিবে—এ অধিকার জনতার নিজস্ব অধিকার পুঁজিবাদী সমাজ এই অধিকার মানিবে না কিন্তু সংঘবদ্ধ জনশক্তিকে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে। তখন হইতেই জন্ম লইবে মেহনাতি ভারতবাসীর সুখের দিন।

কংগ্রেসী রামরাজত্বে অনাহারে আত্মহত্যা

ইহার জন্য জবাবদিহি সরকারকেই করিতে হইবে

Right to work, কাজের অধিকার প্রত্যেকের থাকিবে—এই নীতি ভারত সরকার মানিয়া লইয়াছে। মানিয়া লওয়া অবশ্য মুখে এবং গঠনতন্ত্রের পৃষ্ঠায়; বাস্তবে তাহা কিরূপভাবে প্রতিপালিত হইতেছে তাহা সকলেরই জানা। প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে কাজ দেওয়া দূরে থাকুক নিত্য নূতন ছাঁটাই হইয়া চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি বিভাগে উগ্রভাবে ছাঁটাই করা হইতেছে, বহু বিভাগকে একেবারে উঠাইয়া পর্য্যন্ত দেওয়া হইতেছে। যাঁহারা ১০।১২ বৎসর একাদিক্রমে সরকারের অধীনে কাজ করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টি অতিবাহিত করিয়াছেন তাঁহারাও আজ বেকার হইতেছেন যেহেতু সকলেই অস্থায়ী। ১৫।২০ বৎসর চাকুরী করিয়াও অস্থায়ীত্ব ঘুচে না এইরূপ উদাহরণ বিরল নয়। এখন আবার সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির সুপারিশ মত কর্ম্মচারীদের কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইবার অজুহাতে ছাঁটাইএর বন্দোবস্ত হইয়াছে। এতদিন তবু কিছু কিছু করিয়া হইতেছিল এখন হইতে হইবে mass scale এ লাখে লাখে। সরকারের এই আক্রমণে উৎসাহিত পুঁজিবাদীর দল তাহাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও নির্বিচারে শ্রমিক ও কর্ম্মচারী ছাঁটাই করিয়া চলিতেছে। প্রতিবাদ করিলে সরকারী চণ্ডনীতি নামিয়া আসিবে।

পশ্চিম বাংলা সরকারের দ্বারা প্রচারিত তথ্য মতে ফেবরুয়ারী মাসে জীবনধারণের ব্যয়সূচক সংখ্যা ৩৫৩'৮ (১৯৪৯ সালের আগষ্টে ১০০ ধরিয়া) পয়েণ্ট ছিল প্রতিমাসে কিছু কিছু করিয়া বাড়িয়া বর্ত্তমানে ৩৭৫ পয়েণ্ট হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত কোন মাসেই এই সূচক কমতির পথে যায় নাই বাড়িয়াই চলিয়াছে। অথচ এই বর্দ্ধিত জীবনধারণের ব্যয়ের জন্য বহু-অনুনয় বিনয় করিয়াও যখন ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউটের কর্ম্মচারীরা একটী পয়সা আয় বাড়াইতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া ধর্ম্মঘট করিল তখন তাহাদের উপর চূড়ান্ত নিষ্পেষণ চালাইয়া ছাঁটাই করিয়া তাহাদের জবাব দেওয়া হইল। সেই ছাঁটাই কর্ম্মচারীদের মধ্যে সুরেন পাল বেকার অবস্থায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজের পেটের জন্য একমুঠা ভাতের জোগাড়ে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। ইহার জন্য সরকারকে জবাব দিহি করিতে হইবে। লাখ লাখ টাকা আমোদে উড়াইয়া আর বেতারে বক্তৃতা আর বাণী পাঠাইয়া ইহার সমাধান হয় না। ইহার সমাধান আছে একমাত্র সমাজতন্ত্রের জয়ে। সেই পথেই জনতাকে আগাইতে হইবে।

বাস্তুহারাদের উপর নয়া আক্রমণ

নূতন করিয়া বাস্তুহারা ও অন্নহারা করার ষড়যন্ত্র

পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসী সরকারের জনস্বার্থ রক্ষার প্রমাণ

৩১শে অক্টোবর হইতে ভারত সরকার সমগ্র বাস্তুহারাদের প্রতি নূতন করিয়া নীতি গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন; ফলে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত ২০ লক্ষ বাস্তুহারাদের নূতন করিয়া বাস্তুহারা ও অন্নহারা ক'রবার পাকা ব্যবস্থা করিয়াছে। নূতন নীতি হইতেছে :—

১। ৩১শে অক্টোবরের পর সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী শিবির উঠাইয়া দেওয়া হইবে;

২। ঐ তারিখের পর সরকারী সাহায্য একবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং সরকার পুনর্বসতির জন্য সেই টাকা ব্যয় করিবে;

৩। পুনর্বসতির কাজে পরিবার প্রতি ৭০৲ টাকা গৃহনির্ম্মাণ বাবদে দান এবং ব্যবসার জন্য ৫০০ টাকা ঋণ দেওয়া হইবে;

৪। ১২ই সেপ্টেম্বরের পরে গৃহীত ঋণের আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না।

ঘটা করিয়া প্রচার করা হইতেছে বাস্তুহারারা যাহাতে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অথচ ইহা যে কত বড় ধাপ্পাবাজী তাহা সরকারী নীতিগুলি বিচার করিলেই বুঝা যাইবে। ৩১শে অক্টোবরের পর সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী শিবির উঠাইয়া দেওয়া হইবে। সরকারকে জিজ্ঞাস্য বাস্তুহারারা ঐ তারিখের পর থাকিবে কোথায়? ক্ষমতা হস্তগত করিবার আগে খুব বড় গলায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল বাসস্থান দেওয়া হইবে, চাকুরী দেওয়া হইবে, চাষবাসের জমি দেওয়া হইবে। আজ পর্য্যন্ত প্রকৃত বাস্তুহারাদের কাহাকেও কি তাহা দেওয়া হইয়াছে? না বাস্তুহারার নামে মন্ত্রীদের আত্মীয়স্বজনদের মোটা মাহিনার চাকুরীতে নিয়োগ, বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা, যাহারা জীবনে পিতৃভূমি পূর্ববঙ্গে গিয়াছে কিনা সন্দেহ, তাহাদের গৃহ নির্মাণ বা পুত্রকন্যাদের উচ্চশিক্ষার্থে মোটা টাকা সাহায্যই মিলিয়াছে? বর্তমান আশ্রয়প্রার্থী শিবির বলিয়া যেগুলি পরিচিত সেগুলি নরককুণ্ডেরও অধম, মনুষ্য বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী তথাপি নিছক প্রাণ ধারণের জন্যই বাস্তুহারারা উহাতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া বাস্তুচ্যুত করার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। শুধু তাহাই নয় এতদিন যৎসামান্য যে সরকারী সাহায্য মিলিত তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় অন্নাভাবে ভিক্ষা ভিন্ন অন্য কোন পথ তাঁহাদের রহিল না। নদীয়ায় আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে, আসানসোল, জলপাইগুড়িতে বহু পরিবার মুমূর্ষু একথা এখন আর ঢাকিবার উপায় নাই।

ইহার উত্তরে বলা হইবে—গৃহহারা হইবে কেন? গৃহনির্মাণের জন্য ত এককালীন দান করার ব্যবস্থা হইয়াছে। অন্নাভাবে মরিবে কেন? রুজী রোজগারের জন্য ঋণ দেওয়া হইতেছে। তা বটে। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এককালীন দানের পরিমাণ ৭০৲ টাকা। এখনকার দিনে ৭০ টাকায় দোচালা কুঁড়ে ঘর একখানি দূরে থাকুক সিকিখানিও যে উঠে না—একথা চার পাঁচ তলা প্রাসাদ বিহারী মন্ত্রীদের পক্ষে অজানা হইতে পারে কিন্তু নিছক বাস্তব সত্য। অনেক পরিবার ৭০ টাকায় ঘর তুলিতে গিয়াছিলেন কিন্তু বেকুব বনিয়া আবার আশ্রয় শিবিরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহার উপর সরকারী এই দান দরখাস্ত করিলেই মিলিবে না; চাই কংগ্রেসী পাণ্ডাদের সুপারিশ। আর বর্ত্তমানে বিনা খরচে সুপারিশ যে মিলে না ইহা অজানাও নয়। সুতরাং ৭০৲ টাকাও বাস্তুহারা পরিবারের হাতে আসে না; ছিদ্র দিয়া কংগ্রেসী আশ্রয়প্রার্থী শিবির ইন-চার্জের পকেটে যায়। বনগ্রাম শিবিরের ব্যাপার তাহার প্রমাণ। অভিযোগ করিয়াও প্রতিকার মেলে না, মিলিবেও না।

আর রোজগারের জন্য ৫০০৲ টাকা ঋণ দান। ১২ই সেপ্টেম্বর ত পার হইয়া গিয়াছে। সরকার জানাক কতজন এবং কাহারা এই সাহায্য পাইয়াছে। বর্ত্তমানে একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রতিযোগিতার দিনে অনভিজ্ঞ লোক মোট ৫০০৲ টাকা মূলধন লইয়া ব্যবসায়ে টিকিয়া যাইবে এইরূপ আশা করা অসম্ভব। উপরন্তু বহু বাধা নিষেধের বাঁধনে বাঁধিয়া এই সাহায্যকে এমন রূপ দেওয়া হইয়াছে যে কমিশনারকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তবে যদি ইহা জোটে। কিন্তু সাধারণের পক্ষে তাহা প্রায় অসম্ভব।

সরকারের এত দয়া না দেখাইয়া সোজা পথ দেখাইলে কি হয়? বাড়ীর জন্য পর্য্যাপ্ত টাকা দেওয়া হইতেছে বলা হইয়া থাকে। বাস্তুহারাদের হাতে গৃহনির্ম্মাণের টাকা না দিয়া দয়া করিয়া গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিলেইত চলে। বাস্তুহারারাও চার পাঁচ তলা প্রাসাদ দাবী করিতেছেন না। আর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত পরিবারের শতকরা ৭০ ভাগের মত কৃষিজীবি। তাঁহাদের হাতে ব্যবসায়ের টাকা না দিয়া চাষের যন্ত্রপাতি ও জমি দিলেই ত বাস্তুহারা সমস্যার সমাধান হয় আর সঙ্গে সঙ্গে গরীব বাংলা দেশে এই খাদ্যাভাবের দিনে কিছু ফসলও বাড়ে। জমির নিশ্চয় অভাব নাই। বহু আবাদযোগ্য পতিত জমি আছে, জমিদার জোতদারের খাস জমিও প্রচুর। এগুলি দিলে সমস্যার সমাধান কিছুটা হইতে পারে কি? তবে তাহাতে বর্ত্তমান কংগ্রেসের সমর্থক ও শক্তি জমিদার, জোতদার, পুঁজিপতির দল গোসা করিবে তাই না এই সব করার বাধা?

নেতাদের ধাপ্পাবাজীতে বিশ্বাস করিয়া বাস্তুহারারা যে ভুল করিয়াছেন তাহা হইতে বাঁচিতে হইলে নিজেদের সংগ্রামী সংগঠন গড়িতে হইবে, কংগ্রেসী জো হুকুমদের দলের সংগঠন নয়। এই সংগঠনের নেতৃত্বে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনের সফলতার উপরই তাঁহাদের সুখের ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। এই সংগঠনের আওয়াজ তুলুন; কাজ চাই অথবা ভাতা চাই এই দাবীর পিছনে সংগ্রামী সংগঠনের নেতৃত্বে সকলকে সমবেত করুন, আন্দোলন গড়িয়া তুলুন, তবেই দাবী স্বীকৃত হইবে নচেৎ দুঃখের বোঝা বাড়িয়াই চলিবে।

এল্‌বেনিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

লেখা হয় "তিরানা চলো"। লেখা হয় অবশ্য মার্কিণ সামরিক মিশনের মোড়ল জেনারেল ভ্যান ফ্লীটের হুকুমে। লেখার ভাষা হুবহু গোয়েবোল্‌সের কাছ থেকে ধার করা।

এই ধরণের দস্যুসুলভ প্রচার গ্রীসের সীমানা পার হয়ে অন্য দেশে সংক্রমিত হচ্ছে, যেখানে ফ্যাসিষ্ট প্রভাব এখনো রয়েছে। রোমের ক্ষিদে যেন বেড়ে গিয়েছে। 'প্যারী-মন্দে' পত্রিকা লিখেছে :—"সম্ভবতঃ এলবেনিয়াকে কেন্দ্র করেই ইতালী আর যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে আবার একটা বোঝাপড়া সম্ভব হচ্ছে, যাতে অদূর ভবিষ্যতে এলবেনিয়ার ওপর ইতালীর অছিগিরি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে।"

টিটো আর সালদারিসের সাহায্য নিয়ে ওয়াশিংটন এলবেনিয়ার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করেছে ইতালীর বৈদেশিক দপ্তর বলেন যে তাঁরা নাকি তার মধ্যে নেই। কিন্তু ইতালীর পত্রিকাগুলোয় যেভাবে এলবেনিয়ার বিরুদ্ধে কুৎসার তুবড়ী ফুটেছে তাতে একথা বিশ্বাস করা শক্ত।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশক্তি প্যারীতে একটি "স্বাধীন এলবেনিয়া" কমিটি বসাচ্ছে। এই ধরনের অন্যান্য "কমিটির" মতই এই "কমিটিতে" আছে যত বিশ্বাসঘাতকের দল যারা যুদ্ধের সময়ে জার্মাণ আর ইতালীর ফ্যাসিষ্টদের তাঁবেদারী করেছিল। এদের জন্য ফাঁসিকাঠের মুখে অনেক দিন ধরে লাল ঝরছে। Christian Science Monitor পত্রিকার মতে "কমিটির" বড় দপ্তর শীঘ্রই আমেরিকায় যাবে।

এথেন্সের প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা "কমিটির" সঙ্গে সহযোগিতা করতে খুবই ইচ্ছুক। Acropolis পত্রিকার লণ্ডন প্রতিনিধি লিখছেন যে "কমিটি" গড়ার কথা প্যারী থেকে ঘোষণা করা হলেও, "কমিটির" আসল দপ্তর হবে নিউইয়র্কে, সংগঠন কেন্দ্র হবে লণ্ডনে এবং সরকারী গোয়েন্দারা হবেন সংগঠক। শেষপর্য্যন্ত বড় দপ্তর এথেন্সে নিয়ে যাবার কথা। অনুকূল পরিস্থিতির জন্য গ্রীক বৈদেশিক দপ্তর অপেক্ষা করছেন। দশ বছর ধরে মিশরে নির্বাসিত এলবেনিয়ার ঘৃণ্য শত্রু আমেদ জোগ গলার বিষাক্ত আওয়াজ আজ আবার শোনা যাচ্ছে। সে নিজেকে জাহির করছে—যে সেই এলবেনিয়ার "আইনসঙ্গত শাসক"। এই তাঁবেদার রাজাই ১৯৩৯ সালে দেশকে বিক্রী করে দিয়েছিল।

এলবেনিয়া সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের এই বর্বর প্ররোচনাকে কঠোর ধৈর্য্যের সঙ্গে রুখে চলেছেন। দেশের সমস্ত জনগণ তাঁদের পিছনে।

বিশ্বের গণতান্ত্রিক জনমত ইউরোপের শান্তি ও নিরাপত্তা ভঙ্গ করার এই নির্লজ্জ চক্রান্তকে উপেক্ষা করতে পারে না। গ্রীক আর যুগোশ্লাভ ফ্যাসিষ্টদের এই অপরাধের শাস্তি দিতেই হবে। এই দায়িত্ব হোল বিশ্বসভার। —টাস

গণদাবী

বাঁচতে হলে পুঁজিবাদবিরোধী গণফ্রন্ট গড়ুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাল কিনতে তাদের বাধ্য করিয়েও আমেরিকার বহির্বানিজ্যকে ঠিক জায়গায় দাঁড় করান গেল না; ক্রমশই তা কমতির দিকে। ১৯৪৭ সালের তুলনায় তা শতকরা ২৩ ভাগ কমে গিয়েছে। শুধু আমেরিকা নয় সারা পুঁজিবাদী দুনিয়াই আজ অর্থ-নৈতিক সংকটে কাঁপছে। ফ্রান্সে বেকারের সংখ্যা দেড় গুণ, ইঙ্গ মার্কিন অধিকৃত জার্ম্মাণ অঞ্চলে প্রায় দু গুণ, নরওয়ে ও হল্যাণ্ডে দু গুণ এবং সুইৎসারল্যাণ্ডে তিন গুণের মত বেড়ে গিয়েছে। খোদ বৃটেনেও এই অবস্থা।

ফ্যাসিষ্টরা যুদ্ধ বাধাবেই

পুঁজিবাদী কায়দায় এই সংকট কাটাবার উপায় হচ্ছে একমাত্র যুদ্ধ; কয়েক বৎসরের জন্য সংকট তাতে রোধ হয়; বিনিময়ে দিতে হয় কোটি কোটি সাধারণ মানুষের ধন, প্রাণ, যথাসর্ব্বস্ব। পুঁজি-পতিদের লাভের মাত্রা কিন্তু কমার বদলে বেড়ে যায়। আত্মতৃপ্তিতে খুসী হয়ে দেশবাসীকে আরও জোর করে তারা লড়তে উপদেশ দেয় যাতে তারা আরও মুনাফা লুঠতে পারে। চারিদিক থেকে প্রচার চলে—গণতন্ত্র রক্ষার জন্য লড়াই চালান হচ্ছে অথচ জনসাধারণের কপালে জোটে যুদ্ধে মৃত্যু আর পুঁজিবাদীদের জন্য রচিত হয় মুনাফার পাহাড়। তারপর একদিন যুদ্ধশেষে তারস্বরে ঘোষিত হয় জাতীয় সম্পদ বেড়েছে। যুদ্ধ শেষ হলে আবার দেখা দেয় মন্দা; নির্ব্বিচারে চলে ছাঁটাই,—বুকের রক্ত যার জন্য ঢালল জনতা, দেখে তার কিছুই আসেনি। সেই আগের মত অনাহারে, অর্দ্ধাহারে পশুর জীবন যাপন ছাড়া উপায় নেই। দিন যায় ধনতান্ত্রিক সংকট তীব্র হয়, আবার যুদ্ধের তোড়জোড় করে পুঁজিপতির দল নতুন করে মুনাফা লুঠবার আশায়। এমনি করে যুদ্ধ-বৃত্ত চলে পুঁজিবাদী দুনিয়ায়। আর তাই আজ আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স সর্ব্বত্র পুঁজিবাদী ফ্যাসীবাদীরা ষড়যন্ত্র করেছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের। আমেরিকার Times Herald তাই সম্পাদকীয় লেখে—"Of the two civilizations represented in the struggle, Communism and Christianity, only one will survive. Only one can." সুতরাং খৃষ্টান আমেরিকার বাধাতেই হবে যুদ্ধ। আর সে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হবেনা শুধু শত্রুকে পরাজিত করা, তার উদ্দেশ্য হবে—"The object of war today is to kill the enemy nation, remove its seat of power and wipe it off the face of the earth as a threat for ever"। তাই নির্বিচারে ধ্বংস করে দিতে হবে—"We send planes over at forty thousand feet loaded with atom bombs, fire bombs, germ bombs and trinitrotoluol to slaughter babies in the cradle, grandmothers at their prayers and working men at their jobs"। আর এ শুধু একা Times Heraldই করছেনা; সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার পুঁজিবাদীদের কাগজগুলি যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করে চলেছে, মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে, জনতাকে বিভ্রান্ত করে, সাধারণের যুদ্ধ বিরোধী মনোভাবকে ফ্যাসিষ্ট কায়দায় চুর্ণবিচূর্ণ করে।

ভারতীয় রাষ্ট্রও যুদ্ধ শিবিরে

পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রও তাই পিছিয়ে নেই; সে যে হবে এশিয়ায় ফ্যাসিবাদের পাহারাদার। চিয়াং আজ না থাকার মধ্যে তাই নেহরুর ওপর ভার পড়েছে এশিয়ায় প্রতিক্রিয়ার দুর্গ গড়ার। নিরপেক্ষতার নাম করে চলেছে ফ্যাসিবাদী শিবিরকে যথাশক্তি সাহায্য। ভারতীয় রাষ্ট্র নিরপেক্ষ তাই যখন এক বছর আগে সোভিয়েট প্রতিনিধি এটম বোমের ব্যবহার নিষিদ্ধ ও বৃহৎ শক্তিগুলির সমর সজ্জা অন্ততঃপক্ষে এক তৃতীয়াংশ কমাবার প্রস্তাব আনল তখন ভারতীয় প্রতিনিধি 'মাঝামাঝি' প্রস্তাবের নাম করে সেই প্রস্তাবের বিরোধীতাই করল। ভারতীয় রাষ্ট্র নিরপেক্ষ কিন্তু বর্ম্মার বৃটীশ পুঁজি রক্ষার জন্য আজও সমানে অস্ত্র সে পাঠাচ্ছে। মালয়ে গুর্খা সৈন্য ও পাঞ্জাবী পুলিশ চলেছে, ভিয়েৎনামের ওপর আক্রমণের জন্য লড়াইএর রসদ পাঠান হচ্ছে, ভারতীয় বিমান ঘাঁটি ব্যবহার করতে দিচ্ছে। ভারতীয় রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থেকে এশিয়ার উন্নতি করতে চায় তাই না জাপান আর কোরিয়া থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণের দাবীর বিরোধীতাই করল ভারতীয় প্রতিনিধি জাতিসংঘে, দিল্লীর এশিয়ান কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত হল এশিয়া বহির্ভূত অষ্ট্রেলিয়া, মিশর, দর্শকের নাম করে উপদেষ্টা হিসাবে রইল ইঙ্গমার্কিণ প্রতিনিধি কিন্তু তাতে স্থান হলনা সোভিয়েট এশিয়ার। পণ্ডিতজী নিরপেক্ষ তাইত Imperial General Staff এর প্রধান কর্ত্তা ফিল্ড মার্শাল স্লিম দিল্লী আসছেন; তাঁর এই আসা নিশ্চয় দিল্লীতে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য নয়।

আজকের দিনে কোন দেশ বিচ্ছিন্ন থাকতে চায় না তাইত পণ্ডিত নেহেরু নিরপেক্ষ আন্তর্জাতি-কতার নামে কমনওয়েলথে যোগ দিয়েছেন, হাভানা বাণিজ্যচুক্তিতে সই করেছেন; আতলান্তিক প্যাক্টের মত প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্যাক্ট করার জন্য চেষ্টা করছেন। তাঁর আন্তর্জাতিকতায় মুক্ত চীনের স্থান নেই, ভিয়েৎনাম হোচিমিন সরকারের স্থান নেই, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলির স্থান নেই, স্থান আছে বৃটেনের, স্থান আছে মার্কিণের, স্থান আছে যত রাজ্যের ফ্যাসিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের।

পুঁজিবাদ বিরোধী গণফ্রন্ট একে পরাস্ত করতে পারে

এই যুদ্ধকে প্রতিহত ও পরাস্ত করতে হলে সংগঠিত করতে হবে গণশক্তিকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে জাত বিরাট গণশক্তি নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখেছে যুদ্ধ তাদের ধ্বংস এনে দেবে। তাই তারা চায় না আবার পুঁজিপতিদের কামানের খোরাক হতে। কোটি কোটি মানুষের যুদ্ধ বিরোধী পুঁজিবাদ বিরোধী ঐক্যই প্রতিক্রিয়ার অভিযানকে রুখতে পারে, তাকে চুরমার করে দিতে পারে। যুদ্ধ কৈ, যখন আসবে তখন তাকে প্রতিরোধ করলেই হবে—এই মনোভাব যেমন সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে, তেমনি আবার যুদ্ধ বিরোধী ফ্রন্টকে চূড়ান্ত ভাবে দুর্ব্বল করে দেবে যদি এই ফ্রন্টে জনসাধারণকে টেনে আনতে না পারা যায়। যুদ্ধ এখনও বাধেনি একথা অবশ্য ঠিক কিন্তু যে ভাবে পাগলের মত অস্ত্রশস্ত্র বাড়িয়ে চলেছে ফ্যাসিষ্টরা, যে ভাবে একটার পর একটা সামরিক সম্মেলন ও সামরিক প্যাক্ট হচ্ছে, যে ভাবে প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশে যুদ্ধ বাধাবার পক্ষে প্রচার চলছে, যে ভাবে দ্রুতগতিতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছে তাতে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ যে বাধাবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন থেকেই যদি আমরা জনসাধারণকে প্রস্তুত না করি, এখন থেকেই জনসাধারণকে যদি আমরা প্রতিরোধ সংগ্রাম কেমন করে চালিত করতে হবে সে কথা না বোঝাই, এখন থেকেই শ্রমিকের দৈনন্দিন সংগ্রামকে যুদ্ধের পরি-প্রেক্ষিতে বোঝাবার দায়িত্ব না গ্রহণ করি তা হলে সত্যই যে দিন যুদ্ধ আসবে তখন আমরা দেখব—আমরা কিছুই প্রস্তুত নয়; নীরবে মার খাওয়া ছাড়া উপায় তখন আর কিছু থাকবে না। এই যুদ্ধ বিরোধী ফ্রন্টকে গণফ্রন্ট হতেই হবে—এই একান্ত দরকারী কথাটা যদি ভুলে গিয়ে ভেবে থাকি একে দলীয় ফ্রন্ট, তা হলে মারাত্মক ভুল করা হবে কারণ যত বড় ও যত শক্তিশালীই দল হক না কেন তার একার পক্ষে পুঁজিবাদীর যুদ্ধ চক্রান্তকে ব্যর্থ করা সম্ভবপর হবে না। তাই যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি-সম্মেলন হক আর যাই হ'ক তাতে আহ্বান জানাতে হবে প্রত্যেকটি যুদ্ধ বিরোধী গণতন্ত্রী শক্তিকে। দলীয় গোঁড়ামীর স্থান এতে নেই। তাই আজ প্রকৃত যুদ্ধবিরোধী ফ্রন্ট গড়তে হলে তাকে broad based গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট হিসেবে রূপদিতে হবে। তবে স্বভাবতই নেতৃত্ব থাকবে এর সবচেয়ে সংগ্রামী সবচেয়ে বেশী যুদ্ধ বিরোধী শ্রমিক শ্রেণীর হাতে; পুঁজিবাদবিরোধী শ্রমিক ও নিম্ন কৃষক শ্রেণীর ঐক্যই হবে এর চালক শক্তি।

পার্টি হইতে বহিষ্কৃত

প্রমোদ সিং রায়, নির্ম্মল রায় চৌধুরী ও অজিত বসুকে বার বার সাবধান করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা পার্টি-নিয়মানুবর্ত্তিতা ভঙ্গ করায়, পার্টির আদেশ অগ্রাহ্য করায় এবং পার্টির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়া কলাপে লিপ্ত থাকায় তাঁহাদিগকে পার্টি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রমোদ সিং রায়ের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ—তাঁহার বিরুদ্ধে বিশাখা রায় নাম্নী একজন মহিলা চরিত্রহীনতার যে গুরুতর অভিযোগ আনেন সে বিষয়ে দীর্ঘ সুযোগ পাইয়াও তিনি কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। উপরন্তু দলের কেন্দ্রীয় কমিটি নিশ্চিতভাবে জানিয়েছে যে, প্রমোদবাবু সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের নিকট দলের আভ্যন্তরিণ গোপন সংবাদ সরবরাহের কাজে লিপ্ত ছিলেন। দলের প্রত্যেক সভ্য ও সমর্থককে জানান যাইতেছে, তাঁহারা যেন উপরোক্ত তিনজনের কাহারও সহিত কোনরূপ সম্পর্ক না রাখেন।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস ২৩ ডিকসন লেন হইতে মুদ্রিত ও ১এ একজিবিশন রো, কলিকাতা—১৭ হইতে প্রকাশিত।